

দাড়িভিট ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির অস্তিত্ব সংকট

সুমিত রায়

DARIBHIT BHASHA ANDOLAN
O
BANGALIR ASTITIVA SAMKATA

BY
SUMIT ROY

প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ: বিদ্যাসাগর জয়ন্তী, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ (বৈদ্যুতিন)

প্রচ্ছদ

অয়ন রাহা

প্রকাশক

প্রকাশচন্দ্র দাস, সংহতি ফাউন্ডেশন

মুদ্রক

হিন্দুত্ববুকস

উৎসর্গ

ভাষাবীর রাজেশ ও তাপস

নিবেদন

দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে যেদিন ওই নারকীয় হত্যাকান্ডটি হয় যেদিন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের প্রায় সমস্ত টিভি চ্যানেলের শিরোনামে ছিল ঘটনাটি। অধিকাংশ চ্যানেলেই সেই ভাইরাল হওয়া ভিডিওটি দেখানো হয়, এখানে গুলিবিদ্ধ রাজেশ সরকার লুটিয়ে পড়ছেন তার সহযোদ্ধার হাতে। এতদিন বইয়ে পড়েছি, বক্তৃতায় শুনেছি, ভাষা আন্দোলন, ভাষাবীরদের আত্মবলিদানের কথা কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তা দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হবে এটা কোনদিন ভাবিনি।

মানভূম, বাহান্ন বা শিলচর অনেক আগের কথা, কিন্তু ১৯৮৬ সালে করিমগঞ্জে যখন দিব্যেন্দু দাস আর জগন্ময় দেব বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দেন তখন আমার শৈশব পার হয়নি। ১৯৯৩ সালে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ভাষার জন্য প্রাণ দেন সুদেষ্ণা সিংহ। কমলা ভট্টাচার্যের পর তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় নারী যিনি ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। অনেক পরে জেনেছি সে কথা। তাই পরিণত বয়েসে এসে যখন দাড়িভিট ভাষা আন্দোলনের সাক্ষী হলাম, দোলঞ্চা নদীর তীরে মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষাবীর রাজেশ আর তাপসের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করার সুযোগ পেলাম, নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে হয়।

এতদসত্ত্বেও এটা বলতেই হয় যে, বাঙালি জাতি হিসেবে এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের যে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের ভাষার জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে। কেন বাঙালিকে বার বার ধর্মের জন্য লাঞ্ছিত হতে হবে আর ভাষার জন্য আন্দোলন করতে হবে? এই প্রশ্ন আমাকে তাড়িত করে দাড়িভিট থেকে ফেরার পথে। এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে উপলব্ধি করি বাঙালি আজ কতটা অস্তিত্ব সংকটে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সেই বিশেষণই তুলে ধরেছি এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি যদি একজনও ভাষাপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী বাঙালির মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে তাহলে এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে স্বার্থক মনে করব।

দাড়িভিট কান্ডের ঠিক পাঁচ মাস পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগেই লেখাটি প্রায় সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত কাজের চাপে এটি আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি। সেই থেকে লেখাটি পড়েই ছিল ঐ অবস্থায়। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবসের আগে ভাষাবীর রাজেশ ও তাপসের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানোর উদ্দেশ্যে লেখার কাজটি সম্পন্ন করি।

প্রবন্ধটি ই-বুক আকারে প্রকাশ করার জন্য সংহতি ফাউন্ডেশনের শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস ও শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্যকে মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ই-বুক মুদ্রণ ও হিন্দুত্ববুকস ওয়েবসাইটে ই-বুকটি হোস্ট করার জন্য শ্রী শৌনক রায়চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবার শেষে আমার সহধর্মিণীকে অসংখ্য ধন্যবাদ বানান ভুল ও বাংলা টাইপিংয়ের ভুল ত্রুটিগুলি ঠিক করে দেওয়ার এবং সর্বোপরি লেখাটি সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করার জন্য।

লেখায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। তাই কিছু কিছু বানান প্রচিলিত বানানের থেকে ভিন্ন। এছাড়া কোন প্রকার বানান ভুল বা তথ্যগত ভুল থাকলে পাঠকের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

কলকাতা
২০শে সেপ্টেম্বর ২০২০

বিনীত
সুমিত রায়

দ্রা-ম! দ্রা-ম! দ্রা-ম! এক লহমায় শরীর ফুঁড়ে বেড়িয়ে গেল পুলিশের বুলেট! দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন তাপস বর্মণ। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তখন আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও পুলিশের মধ্যে তুমুল গন্ডগোল। আন্দোলনে সামিল তাপস নজর রাখছিলেন রাস্তার দিকটায়। কিন্তু মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সব কিছু। সহসা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। দেখতে পেলেন অপসৃয়মান পুলিশের গাড়িটিকে। জানালা দিয়ে তখনও বেরিয়ে আছে ঘাতক হাতটি!

উল্টো দিকেই বাড়ির সামনে দোকান থেকে ছুটে এলেন মা। হাহাকার করে ডাকতে শুরু করলেন তাপসের বাবাকে, বোন ডলিকে। কিন্তু ততক্ষণে বীরাত্মা তাপস তাদের ছেড়ে অমরত্বের পথে। তাঁরা এসে পৌঁছানোর আগেই মায়ের বুকে মাথা রেখে, রক্তে ভেজা মায়ের আঁচলেই ঝিমিয়ে পড়েন তাপস বর্মণ। বোন ডলি যখন এল, তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাপসের অচৈতন্য দেহ। রক্ত চুইয়ে পড়ছে ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা রাখির উপর। ঠিক এক মাস আগে রাখি পূর্ণিমার দিনে দাদার হাতে রাখিটি বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না কিশোরী ডলি। দাদাকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন তিনি।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গন্ডগোল হচ্ছে সংবাদ পেয়ে তড়িঘড়ি কলেজ থেকে বাড়ি ফেরেন রাজেশ সরকার। ছোটো বোন মৌ দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। দাদা রাজেশও প্রাক্তন ছাত্র।

বাংলায় শিক্ষার দাবিতে ভাই-বোন দু'জনেই আন্দোলনে সামিল। পুলিশ নাকি সমস্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ঘিরে ফেলেছে। কিছু হয়নি তো বোনের? ভাত বেড়ে বসেছিলেন মা। বারণ করেছিলেন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে না যেতে। মৌ ঠিকই চলে আসবে। মায়ের বারণ না শুনেই, বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন রাজেশ। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে চেঁচামেচি, হইচই। এরই মধ্যে গুলির আওয়াজ। বোনকে খুঁজতে থাকেন রাজেশ। হঠাৎ গুলির আঘাতে পাল্টে যায় সব কিছু। বন্ধুর দুই হাতের মধ্যেই লুটিয়ে পড়েন তিনি।

মাঠে চাষ করছিলেন বাবা। ছুটে আসেন তিনি। রাজেশ তখন মাটিতে শুয়ে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। গলার গামছা দিয়ে ক্ষতস্থান বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করার খানিক চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু তাতে কী আর হয়? ক্ষত যে গভীর! এদিকে ক্রমশ বুজে আসছে বীরাত্মা রাজেশের চোখ!

উপস্থিত সকালে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন রাজেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার। গুলিবিদ্ধ রাজেশ ও তাপসকে নিয়ে একদল ছাত্র রওনা হয় হাসপাতালের দিকে। কিন্তু পথেই তাদের অবরোধ করে একদল দুষ্কৃতী। রাজেশ-তাপসকে যারা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল, শুধু তাদেরই নয় রাজেশ-তাপসকেও তারা বেধড়ক মারধর করে। সেদিনই হাসপাতালে মৃত্যু হয় রাজেশের, পরদিন ভোরে মৃত্যু হয় তাপসের। এভাবেই মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয়ী হন ভাষাবীর রাজেশ ও তাপস।

বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে বাঙালির এই আত্মবলিদান, এ তো নতুন কিছু নয়! দেশভাগের পর থেকে বাঙালিকে দফায় দফায় আন্দোলন করতে হয়েছে বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের জন্য। দিতে হয়েছে রক্ত, দিতে হয়েছে প্রাণ। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মনে করতেন উপমহাদেশের মুসলমানদের একমাত্র ভাষা হল উর্দু, কারণ তা মুসলমান জাতির ধর্ম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের এক শতাংশেরও কম জনগণের যে মাতৃভাষা উর্দু, বা ১৫ শতাংশ বাঙালি হিন্দু জনগণের যে উর্দুর সাথে কোনো সম্বন্ধই নেই সে কথা গ্রাহ্য করার প্রয়োজনবোধ করেননি পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ।

পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রস্তাব পেশ করা হয়। এর প্রত্যুত্তরে ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি তোলেন পূর্ববঙ্গ থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানান পূর্ববঙ্গ থেকে নির্বাচিত অপর তিন বাঙালি হিন্দু সদস্য প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান (পূর্ববঙ্গ থেকেই গণপরিষদে মনোনীত সদস্য), পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন (বাংলা পড়তে জানতেন না) এবং গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার ও

পূর্ববঙ্গের বিশিষ্ট গণপরিষদ সদস্য মৌলবি তমিজুদ্দিন খান। পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমান সদস্যগণ নীরব থেকে লিয়াকত আলি খান ও খাজা নাজিমুদ্দিনকেই সমর্থন করেন। উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষার দাবিদার হিসেবে সমর্থন করে তাঁরা বাংলা ভাষার অবমাননা করেন।

গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব নস্যাৎ হলেও পূর্ববঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবিতে অরাজনৈতিক গণ আন্দোলন শুরু হয়। ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্থাপিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। পূর্ববঙ্গের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এই গণ আন্দোলন। আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুর সম্পৃক্ততা ছিল সর্বত্র। আন্দোলন থেকে বাংলাভাষী মুসলমানকে দূরে রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থকে প্রচার করা হয় যে আন্দোলনটি পরিচালিত হচ্ছে ভারত থেকে, ভারত থেকেই আন্দোলনকারীরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে আন্দোলন করছে। কিন্তু তাতেও যখন সাধারণ বাংলাভাষী মুসলমানকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখা গেল না, তখন প্রশাসন বাঙালি হিন্দুর উপর দমন-পীড়ন নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে। নারায়ণগঞ্জের মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এডভোকেট বিনয়কৃষ্ণ রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। যশোরের ছাত্রনেতা অনন্তকুমার মিত্রকে কারাবন্দি করে রাখা হয়।

এই সময়ে পাকিস্তানের গভর্ণর-জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ববঙ্গ সফর করেন। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ তারিখে তিনি রমনার ময়দানে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি ভাষণে ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। তিন দিন পর ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে উর্দুর গুরুত্ব তুলে ধরেন। একমাত্র উর্দু ব্যতীত অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিদারদের তিনি দেশদ্রোহী আখ্যা দেন। সেদিনও পূর্ববঙ্গের কোনো বাংলাভাষী মুসলমান নেতা এর প্রতিবাদ করেননি। এইভাবে বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে পদদলিত করে উচ্চাসনে বসে উর্দু।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারি ১৯৫২ তারিখে একটি বক্তৃতায় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে ‘উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ নীতিতে অনড় থাকেন। এর প্রতিবাদে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়। সেইদিন পুলিশের গুলিতে অনেকের মৃত্যু হয়, পুলিশ ও মিলিটারি রাতে মর্গ থেকে বহু মৃতদেহ গুম করে। নিহতদের মধ্যে মাত্র চার জনের নাম জানা যায়। পূর্ববঙ্গ আইনসভাতে মনোরঞ্জন ধর, বসন্তকুমার দাস ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ ছয়জন সদস্য মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে আহত ছাত্রদের দেখার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার আহ্বান জানালে, তিনি যেতে অস্বীকার করেন। পরের দিন প্রতিবাদ মিছিলেও পুলিশের গুলি চলে। অন্ততপক্ষে চার জনের মৃত্যু হয়, কিন্তু মাত্র দু’জনের নাম জানা যায়। এই ঘটনার পর সালে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে উর্দুর সাথে যুগ্ম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।

দেশভাগের পর স্বাধীন ভারতে বাঙালিকে যে তার ভাষিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে তার পটভূমি বুঝতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে অতীতে। বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালি। সুচতুর ব্রিটিশ তার শত্রুকে চিনতে ভুল করেনি। এর আগে উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসক 'মার্শাল রেস থিওরি' নামক এক অসাড় তত্ত্ব খাড়া করে সেনাবাহিনীতে বাঙালির প্রবেশ বন্ধ করেছিল। এইবার তারা সুচতুরভাবে বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা করল। বাঙালি হিন্দুর কোমর ভেঙে দিতে বাংলাকে তারা এমনভাবে ভাগ করল যাতে উভয় ভাগেই বাঙালি হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রবল চাপে ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হয়। ১৯১২ সালে দুই বঙ্গকে পুনরায় যুক্ত করা হয়। এই সংযুক্তিকরণের সাথে সাথে আসাম আগের মত পৃথক প্রদেশ হিসেবে গঠিত হয় এবং বাংলা থেকে বিহার ও উড়িষ্যাকে বিযুক্ত করে বিহার-উড়িষ্যা নামক একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়। ব্রিটিশ সরকার এই প্রদেশ পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলার একাধিক বাঙালি হিন্দু অধ্যুষিত সীমান্ত জেলাকে বাংলা থেকে বের করে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সাথে যুক্ত করে। সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে আসামের সাথে যুক্ত করা হয়। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, সেরাইকেলা-খরসাওয়া, সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জ

জেলাকে বিহার-উড়িষ্যার সাথে যুক্ত করা হয়। এইভাবে যুক্তবঙ্গে বাঙালি হিন্দুকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর উক্ত জেলাগুলিতে (সিলেট বাদে) শিক্ষায় ও সরকারি কাজে অসমিয়া, হিন্দি বা ওড়িয়া ভাষার প্রচলন হয়। ফলে বাঙালিকে লড়তে হয় তার ভাষিক অধিকারের জন্য। সিলেট ইতিমধ্যেই এক বিতর্কিত ও কলঙ্কিত গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আসামে কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলায় বাঙালির ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। পশ্চিমে জনসংখ্যার নিরিখে মানভূম ছিল বিপুলভাবে বাংলাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। অন্যান্য জেলায় তেমনভাবে না হলেও মানভূম জেলায় বাঙালির ভাষা আন্দোলন, যা কি না ব্রিটিশ আমলেই শুরু হয়েছিল, অব্যাহত থাকে।

১৯১২ সালে মানভূম জেলা নব্যগঠিত বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের বিহার অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তর্ভুক্তির পর থেকেই বিহার-উড়িষ্যা সরকার মানভূম জেলায় হিন্দি ভাষার প্রসারের চেষ্টা করতে থাকে। ১৯৩১ সালের জনগণনায় দেখা যায় যে জেলার সদর মহকুমার জনসংখ্যার ৮৭% বাংলাভাষী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দি ভাষার প্রসার ও হিন্দি মাধ্যম বিদ্যালয় চালু করার উদ্দেশ্য নিয়ে ‘মানভূম-বিহার সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালে বিহারে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এসে ‘ডোমিসাইল সার্টিফিকেট আক্ট’ প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে, সরকারি কন্ট্র্যাক্টে, স্কুল

ও কলেজে ভর্তির ব্যাপারে নানান বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে বাঙালিকে কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানভূমের নতুন জেলা স্কুল পরিদর্শক, জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরে হিন্দি বাধ্যতামূলক করে দেন। জেলা স্কুলে বাংলা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়।। স্কুল এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হিন্দিতে সাইনবোর্ড বাধ্যতামূলক করা হয়। বাঙালিদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয়। মানভূম জেলার বাঙালি কংগ্রেস নেতারা জেলায় বাংলাকে সরকারি ভাষা ঘোষণা করার দাবি জানান। ৩০শে মে ১৯৪৮ তারিখে, বিহার প্রদেশ কংগ্রেস ৫৫-৪৩ ভোটে সেই দাবি নস্যাৎ করে দেয়। এর প্রতিবাদে ১৪ই জুন মানভূম জেলা কংগ্রেসের বাঙালি নেতৃবৃন্দ অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে 'লোক সেবক সংঘ' প্রতিষ্ঠা করে বাঙালির উপর বলপূর্বক হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন। ১৯৫২-এর নির্বাচনের পর 'লোক সেবক সংঘ' - এর নির্বাচিত প্রতনিধিরা বিহার বিধানসভায় ও লোকসভায় মানভূম জেলার বাংলাভাষীদের ভাষিক অধিকারের কথা তুলে ধরেন। হাল-জোয়াল ও টুসু সত্যাগ্রহের মাধমে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৫৪ সালে বিহার সরকার বাঙালির প্রাণের টুসু গানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অতুলচন্দ্র ঘোষ, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, ভজহরি মাহাতো, হেমচন্দ্র মাহাতো প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে কারাগারে প্রেরণ করে সরকার।

১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন মানভূম জেলার ৩১টি থানার মধ্যে ১৬টি থানাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের দুই কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী যথা বিধানচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণ সিংহ একটি যৌথ বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সংযুক্তিকরণ করে 'বিহার পশ্চিমবঙ্গ সংযুক্ত প্রদেশ' নামক এক নতুন প্রদেশের প্রস্তাবনা করেন। এর প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও মানভূম জেলায় সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে 'লোক সেবক সংঘ' পুরুলিয়া থেকে কলকাতা পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পদযাত্রার আয়োজন করে। ২০শে এপ্রিল ১৯৫৬ তারিখে পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা গ্রাম থেকে এক হাজার বাঙালি পদযাত্রা শুরু করেন। ৬ই মে যখন পদযাত্রা কলকাতা পৌঁছায়, ততদিনে পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন লক্ষাধিক মানুষ। বিধানচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবনার অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়। অবশেষে পয়লা নভেম্বর মানভূম জেলার সদর মহকুমা পুরুলিয়া জেলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম বাংলা ভাষা আন্দোলনে জয়লাভ হয় বাঙালির।

আসামে বাংলাভাষী অধ্যুষিত জেলার অন্যতম হল গোয়ালপাড়া যা ঐতিহাসিকভাবে বাংলারই অংশ ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে আসাম সরকার নানান কৌশলে জেলায় বাংলা মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠন-পাঠনের উপর নানান বিধিনিষেধ আরোপ

করতে থাকে। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি অসমিয়া মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৫০-৫১ শিক্ষাবর্ষে বাংলা মাধ্যমের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫০ থেকে নেমে আসে তিনে। একই সময়ে অসমিয়া মাধ্যমের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪৮ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৮৩৩।

১৯৫৩ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকা বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায়। আসামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন গোয়ালপাড়া জেলার বাঙালি সমাজও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের কংগ্রেসের দাবির পক্ষেই ছিল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের গোয়ালপাড়া আসার সংবাদ প্রকাশিত হতেই অসমিয়া নেতৃত্বের ধারণা হয় যে কমিশন হয়ত গোয়ালপাড়া জেলাকে বাঙালিদের দাবির মুখে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করবে। অসমিয়া উগ্রজাতীয়তাবাদীদের রোষানলে পড়ে গোয়ালপাড়ার বাঙালি সমাজ। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে গোয়ালপাড়া জেলায় বঙাল খেদার সূচনা হয়। বাঙালির উপর পরিকল্পিত আক্রমণের পুরোভাগে ছিল ন-অসমিয়া মুসলমান ও গারো দুর্বৃত্তের দল।

গারো নেতৃত্ব পুনর্বাসিত বাঙালি শরণার্থীদের বিতাড়নের ডাক দেয়। ১৫ই মার্চ ধুবড়ি সংলগ্ন একটি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে বাঙালির কালী মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অশোকা অষ্টমীর পুণ্যস্নানের জন্য ধুবড়িতে আগত হাজার হাজার বাঙালি নরনারীকে

লাঞ্ছিত করা হয়। ধুবড়ি শহর ট্রাকে করে টহল দিতে থাকে গারো ও ন-অসমিয়া গুন্ডার দল। অসমিয়াতে শ্লোগান দিতে থাকে 'কুকুর পোয়ালী বঙ্গালী ওলাই যোয়া' ("কুকুরের বাচ্চা বাঙালি চলে যা")। বাসুগাঁও বাঙালি বিদ্যালয় গুণ্ডারা লুঠ করে ধ্বংস করে। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে জেলার বিলাসীপাড়া, চাপর, বঙ্গাইগাঁও, বাসুগাঁও ইত্যাদি অঞ্চলে। হাজার হাজার বাঙালি শরণার্থী আসাম ছেড়ে আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গোয়ালপাড়ার প্রশ্নে আসামের পক্ষেই রায় দেন। গোয়ালপাড়ার বাঙালি এক নির্যাতিত ভাষিক সংখ্যালঘুতে পরিণত হন।

স্বাধীনতার পর থেকে অসমিয়া নেতৃবৃন্দ বহুভাষী আসামে অসমিয়াকেই একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে তৎপর ছিলেন। বাঙালি ও পার্বত্য জাতিসমূহ অসমিয়া নেতৃবৃন্দের এহেন বিমাতৃসুলভ আচরণে খুশি ছিলেন না। অদূর ভবিষ্যতে উগ্রজাতীয়তাবাদী অসমিয়া নেতৃত্বের হাতে নিপীড়নের আশঙ্কা করেই রাজ্য পুনর্গঠনের সময় বরাকের বাঙালি নেতৃত্ব মণিপুরি নেতৃত্বকে পাশে নিয়ে বরাক উপত্যকা, পার্বত্য উত্তর কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড় (বর্তমানে মিজোরাম) ও ত্রিপুরাকে নিয়ে 'পূর্বাচল' নামে একটি নতুন প্রদেশের প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু কমিউনিস্টদের প্ররোচনায় মণিপুরি নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

১৯৬০-এর এপ্রিল মাসে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস অসমিয়াকেই একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন।

এর পরেই ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বঙাল খেদা শুরু হয়। উত্তর কামরূপের গোরেশ্বরে একটি গণহত্যাকাণ্ডে ন'জন বাঙালি প্রাণ হারান। ৫০,০০০ বাঙালি শরণার্থী আশ্রয় নেন পশ্চিমবঙ্গ, বরাক উপত্যকা ও ত্রিপুরায়। ১০ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী বিমলপ্রসাদ চালিহা বিধানসভায় অসমিয়াকে একমাত্র সরকারি ভাষার স্বীকৃতির পক্ষে বিল পেশ করেন। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষের ভাষাকে বাকিদের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন করিমগঞ্জের বাঙালি বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস। বাঙালির এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২৪শে অক্টোবর বিল পাশ হয়ে যায়।

বাংলাভাষী অধ্যুষিত অসমিয়াশূন্য বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে ব্রাত্য করে অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে, সত্যাগ্রহ ও পদযাত্রার মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলেন পরিষদ নেতৃবৃন্দ। ১৯শে মে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ হরতালের ডাক দেন তাঁরা। শিলচরে উনিশে মে সকাল থেকেই সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে রেল অবরোধ করা। বেলা আড়াইটের দিকে আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা একদল সত্যাগ্রহীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়ার সময় বাকিরা তার প্রতিবাদে দৌড়ে যান সেখানে। উত্তেজিত জনতাকে প্রতিহত করতে জওয়ানরা আচমকাই গুলিচালনা করে। সেনার গুলিতে ১১জন বাঙালি বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে বলিদান দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুই

কিশোর-কিশোরী শচীন্দ্রচন্দ্র পাল ও কমলা ভট্টাচার্য্য। মঈনুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বরাকের বাংলাভাষী মুসলমান, এই ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা শুধু বিরোধিতাই করেননি, আসামে অসমিয়াকে একমাত্র সরকারী ভাষার দাবিতে বাংলায় শ্লোগান দিতে দিতে বাঙালি হিন্দুর দোকান-বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছেন। শিলচরের ঘৃণ্য গণহত্যাকান্ডের পর আসাম সরকার বরাক উপত্যকায় জেলাস্তর পর্যন্ত সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের স্বীকৃতি দেয়।

এগারো জন বাঙালির আত্মবলিদানের পরেও বাংলা ভাষায় শিক্ষার অধিকারের জন্য বারে বারে রক্ত দিতে হয়েছে বাঙালিকে। ১৯৭২ সালে আসামের কংগ্রেস সরকার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অসমিয়া মাধ্যমে পঠন পাঠন বাধ্যতামূলক করে। প্রতিবাদে ফের গর্জে ওঠে বরাক। ১৪ই সেপ্টেম্বর বনধ ডাকা হয়। বনধ চলাকালীন করিমগঞ্জের সুভাষনগরে বনধ বিরোধীরা বনধ পালনকারীদের বাধা দেয়। আন্দোলনের তরুণ নেতা বিজন চক্রবর্তী সেখানে ছুটে যান এবং সংঘর্ষে বনধ বিরোধীদের ছুরিকাঘাতে আত্মবলিদান দেন। ১৯৮৬ সালে আসামের অসম গণপরিষদ সরকারের আমলে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে বাতিল করার নির্দেশ দেন। করিমগঞ্জে সেই নির্দেশনামার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়।

আন্দোলনে অংশ নিয়ে নির্দেশনামার বিরোধিতা করার সময় পুলিশের গুলিতে আত্মবলিদান দেন জগন্ময় দেব ও দিব্যেন্দু দাস।

মানভূম, গোয়ালপাড়া, শিলচর, করিমগঞ্জ হয়ে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের গৌরব রথ অবশেষে প্রবেশ করে পশ্চিমবঙ্গে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার দাড়িভিট গ্রামে। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা দেশভাগের আগে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। দেশভাগের সময় যে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয় তাতে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কোনো সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে ইসলামপুর মহকুমাকে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা থেকে বিযুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সাথে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার বাঙালি হিন্দু শরণার্থী দফায় দফায় আশ্রয় নেয় ইসলামপুর মহকুমায়। পরে ১৯৯২ সালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাকে বিভক্ত করে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গঠন করা হয়। রায়গঞ্জ (সদর) ও ইসলামপুর মহকুমা নিয়ে গঠিত হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা।

ইসলামপুর মহকুমার প্রধান ভাষা বাংলা, সূর্যপুরি ও উর্দু। সূর্যপুরি ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষা যা বাংলা, মৈথিলী, অসমিয়া ও কামতাপুরি ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সূর্যপুরি ভাষার সাথে উর্দুর কোনো যোগাযোগ নেই। এই ভাষা হিন্দু-

মুসলমান উভয়েরই ভাষা। ইসলামপুর মহকুমার ৪৯% বাংলাভাষী, ২৩% সূর্যপুরিভাষী ও ১৭% উর্দুভাষী। কিন্তু ইসলামপুর ব্লকে ৫৭% সূর্যপুরিভাষী, ৩০% বাংলাভাষী ও মাত্র ৮% উর্দুভাষী। সূর্যপুরি ভাষা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত হওয়ায় এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষার সাথে বহুলাংশে সাদৃশ্যযুক্ত হওয়ায়, সূর্যপুরিভাষীরা বাংলা মাধ্যমেই শিক্ষালাভ করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন।

ইসলামপুর সদর শহর থেকে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে ইসলামপুর-গোয়ালপোখর সড়কের উপর অবস্থিত দাড়িভিট। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শ'য়ে শ'য়ে ছিন্নমূল তপশিলি বাঙালি পরিবার আশ্রয় নেন দাড়িভিটে। নতুন করে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। বাঙালির কর্মনিষ্ঠায় অর্থনীতির উন্নতি হয় ওই অঞ্চলে। দড়িভিট আজ কোনো গন্ডগ্রাম নয়, মাঝারি মাপের গঞ্জ বলা চলে একে।

দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এক-দেড়শো মুসলমান ছাত্রছাত্রী আছেন। সকলেই বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করেন। স্কুলে কোনোকালেই কোনো উর্দু ছাত্রছাত্রী ছিল না। ২০০৮ সালে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে অনৈতিকভাবে স্কুলটিকে বাংলা মাধ্যম থেকে দ্বি-মাধ্যম স্কুলে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে বাংলার পাশাপাশি থাকবে উর্দু মাধ্যম। সেইমত একজন উর্দু মাধ্যমের শিক্ষকও নিয়োগ হন। তিনিই সব ক'টি বিষয় পড়াতেন। দূর থেকে পড়তে আসত অল্প কিছু ছাত্রছাত্রী। ২০১৪ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে

অনিয়মিত হয়ে পড়লে উর্দু মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা অন্য স্কুলে চলে যায়। নিজে থেকেই বন্ধ হয় যায় কর্তৃপক্ষের এই অবাস্তব প্রকল্প।

২০১৮ সালে কর্তৃপক্ষ আবার চেষ্টা করে স্কুলটিতে সমান্তরাল উর্দু মাধ্যম চালু করতে। কিন্তু তখন বাংলা মাধ্যমেই শিক্ষকের অভাব। স্কুলে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক মাত্র ১৩ জন, পার্শ্বশিক্ষক মাত্র পাঁচ জন ও কম্পিউটার প্রশিক্ষক চার জন। বাংলাসহ বিজ্ঞান ও কলাবিভাগের ১৫টি শিক্ষকপদ দীর্ঘ দিন ধরে খালি। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য WBCSSC 1ST SLST-এর সফল হবু শিক্ষক, যারা কাউন্সেলিংয়ে দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়কে নির্বাচন করেন, তাঁরা পরে জানতে পারেন, স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে শিক্ষক পদ শূন্য পড়ে আছে নবম-দশম শ্রেণির। একই অবস্থা আরও অনেক স্কুলে। তখন বিভিন্ন জেলার স্কুল পরিদর্শকরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে উক্ত শিক্ষকরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিফিউজাল লেটার লিখিয়ে পুনরায় কাউসেলিংয়ের জন্য WBCSSC-এর কাছে আবেদন করবেন। সকল শিক্ষক সেটি করলেও উর্দু শিক্ষক মোঃ সানাউল্লাহ সেটি করেননি।

এর পরও দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে শূন্য শিক্ষক পদ পূর্ণ না হলে, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্কুল পরিদর্শক নবম-দশম শ্রেণির শূন্য পদগুলিকে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শূন্য পদে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে উর্দু মাধ্যমের শিক্ষক নিয়োগের পথ সুগম হয়। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের শিক্ষক নিয়োগ হওয়া অনিশ্চিত বুঝে

ছাত্রছাত্রীরা ইসলামপুর-গোয়ালপোখর সড়ক অবরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ তখন তাঁদের মৌখিক আশ্বাস দেন। পাশাপাশি স্কুল পরিদর্শকও লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উর্দু শিক্ষক নিয়োগ হবে না। ১৮ই সেপ্টেম্বর জেলা স্কুল পরিদর্শক ও বিডিওর উপস্থিতিতে স্কুল পরিচালন সমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির উর্দুর শিক্ষক নিয়োগ হবে না। কিন্তু স্কুল পরিচালন সমিতিকে অন্ধকারে রেখে রাতারাতি সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে কর্তৃপক্ষ। ২০শে সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ উর্দু শিক্ষককে স্কুলে যোগ দিতে বলেন। ভারসাম্য আনার জন্য সংস্কৃত শিক্ষককেও যোগ দিতে বলেন। চুপিসারে স্কুলে ঢোকেন উর্দু শিক্ষক, সটান চলে যান প্রধান শিক্ষকের ঘরে।

ছাত্রছাত্রীরা যখন জানতে পারেন যে উর্দু মাধ্যমের শিক্ষক স্কুলে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা তখন বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্রায় দু'শো ছাত্রছাত্রী প্রধান শিক্ষকের ঘর ঘেরাও করে তাঁর সঙ্গে দেখা করার দাবি জানান। কিন্তু তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন। এতে উত্তেজিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা প্রধান ফটক বন্ধ করে স্কুলের সামনে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রধান শিক্ষক তখন স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি নিশাকুমার গণেশকে মেসেজ করে সমগ্র পরিস্থিতির কথা জানান। আশরাফুল হক নামে এক শিক্ষক ফোন করে পুলিশ, বিডিও ও স্কুল পরিদর্শককে সংবাদ দেন। সাড়ে তিনটে নাগাদ বিশাল

পুলিশবাহিনী পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। ছাত্র-পুলিশ খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। বিক্ষোভকারী ছাত্রছাত্রীর উপর কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোঁড়ে পুলিশ। রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় স্কুল প্রাঙ্গণ। আচমকাই পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় ছাত্রনেতা রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণের। পুলিশের গুলিতে জখম হন আর এক ছাত্র বিপ্লব সরকার, স্থানীয় ব্যবসায়ী মধু বর্মণ ও এক অভিভাবক কৃপানাথ সরকার। সংঘর্ষে তিন জন পুলিশকর্মী ও ন'জন স্থানীয় বাসিন্দা আহত হন। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে স্বর্ণাক্ষরে রচিত হয় বাঙালির ভাষা আন্দোলনের নবতম অধ্যায়।

১৯৩৭-এ বিহারে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এক্ট বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে, ১৯৪৮-৫২ সালের পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৮-৫৬ সালের মানভূমের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৫-৬১ সালের আসামের ভাষা আন্দোলন, এবং পরবর্তীকালে ১৯৭২ ও ১৯৮৬ সালে বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জে এবং পরিশেষে ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিকে বারে বারে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে। এতগুলি ভাষা আন্দোলন ও ভাষাবীর-বীরাঙ্গনাদের আত্মবলিদানের মধ্যে দাড়িভিটের ভাষা আন্দোলন ও রাজেশ-তাপসের আত্মবলিদান বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাঙালিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে রক্ত দিতে হল, প্রাণ দিতে হল। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, বাঙালি

যেখানে সংখ্যালঘু, সেখানে অবাঙালি শাসকশ্রেণি যে বাঙালির ভাষা আন্দোলনকে সুনজরে দেখবে না, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আর শাসকশ্রেণি যদি হয় চরম পরজাতিবিদ্বেষী উগ্র জাতীয়তাবাদী তাহলে তো কথাই নেই। বুলেটের ভাষাতেই মিলবে শাসকশ্রেণির উত্তর। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিহারের মানভূম ভাষা আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক। সেখানে রক্তপাতের কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না, প্রাণহানির ঘটনাও শোনা যায় না। পূর্ব পাকিস্তান ও আসামে শাসকশ্রেণির সহজাত বাঙালি বিদ্বেষের কারণে, বাঙালিকে দিতে হয়েছে রক্ত, দিতে হয়েছে প্রাণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কেন বাঙালিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে দিতে হল প্রাণ? পশ্চিমবঙ্গের শাসকশ্রেণি বাঙালি হয়েও কিভাবে পারল দুই বাঙালি তরুণের প্রাণ নিতে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

দেশভাগের সময়কালেই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। দেশভাগের সময় বাংলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গে বিভক্ত হয়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় ও পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয়, পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভ করে বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়। দেশভাগের পর থেকে পূর্ববঙ্গে একের পর এক বাঙালি হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা ও গণহত্যার ফলে লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। এর ফলে পূর্ববঙ্গে বাঙালি হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪১ সালে যেখানে পূর্ববঙ্গে ২৮%

বাঙালি হিন্দু ছিল, ২০১১ সালের জনগণনায় তা ৮ শতাংশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বরকত তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, প্রতিদিন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু বাংলাদেশ ত্যাগ করছেন। ২০১৬ সালে প্রকাশিত তার একটি গবেষণাপত্র থেকে জানা যায় যে ২০৪৬ সালে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ হিন্দুশূন্য হবে। অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের নোয়াখালি গণহত্যার ঠিক একশো বছর পর গোলাম সারওয়ারদের স্বপ্ন সার্থক হবে।

একদিকে যেখানে পূর্ববঙ্গ-পূর্বপাকিস্তান-বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ২৮% থেকে কমতে কমতে শূন্যের দিকে যাচ্ছে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও সেখানে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত একচুলও বাড়ছে না, বরং কমছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, দেশভাগের সত্তর বছরেরও পর কেন আজ সংখ্যাতত্ত্বের এই প্যারাডক্স বিশ্ববাসীর সামনে? সংখ্যাতত্ত্ববিদ ও ডেমোগ্রাফার বিমল প্রামাণিক তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন কীভাবে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৯%, ২০১১ সালের জনগণনায় তা ২৭%-এ এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের ভাষায় যা ৩০%। ০-৬ বয়ঃক্রমের মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা প্রায় ৪০%। মুসলমান সমাজে জন্মহার স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি। ২০০১-২০১১ আন্তঃসেনসাস দশকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের

জন্মহার সারা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশি। কিন্তু শুধুমাত্র অধিক জন্মহার দিয়ে জনসংখ্যার অনুপাত এতটা বাড়তে পারে না। বলা বাহুল্য যে এই জনবিস্ফোরণ অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলেই সম্ভব হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকেই এই অবৈধ অনুপ্রবেশ চলে আসছে। **১৯৭১** সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে উর্দুভাষী বিহারি মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাকে সহযোগিতা করার জন্য শত্রুরূপে চিহ্নিত হয়। পাকিস্তান এই সকল বিহারি মুসলমানকে পুনর্বাসন দিতে অস্বীকার করলে তারা ভারতে চলে আসতে থাকে। কলকাতা সংলগ্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের মুক্তাঙ্গন।

১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে রাজাকারদের পুনর্বাসন ও রাজনীতিতে প্রবেশের পর এবং **১৯৮০**-এর দশকের শুরুর দিকে সৌদি অর্থে বাংলাদেশে সালাফিকরণের আবহে গোলাম আযম প্রভৃতি ইসলামি চিন্তাবিদ পরোক্ষভাবে মুসলমানদের ভারতে প্রব্রজনকে সমর্থন করতে থাকেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়তে থাকে অনুপ্রবেশের ঢেউ, যা আজও অব্যাহত।

বাংলাদেশের মাটি থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশের শেষ পর্যায়ে পড়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ। একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ছোট ছোট দলে পশ্চিমবঙ্গে অবৈধভাবে

অনুপ্রবেশ করতে থাকে শ'য়ে শ'য়ে রোহিঙ্গা, যা আজও অব্যাহত। কয়েক হাজার রোহিঙ্গা আজ পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিদেশের মাটি থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত মুসলমান প্রব্রজন অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এই যুগপৎ অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশ ও মুসলমান প্রব্রজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাসের ভারসাম্য আজ নষ্ট হয়েছে। পাঁচটি ডিভিশনের মধ্যে একটি ডিভিশন, ২৩টি জেলার মধ্যে তিনটি জেলা, ৩৪১টি ব্লকের মধ্যে ৬৫টি ব্লকে হিন্দুরা আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতেই ধর্মীয় জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মগরাহাট-১ ব্লকে ১৯৮১ সালে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৮১%, ১৯৯১ সালে তা নেমে আসে ৪০% তে।

এই অনুপ্রবেশ ও প্রব্রজনের ফলে যে শুধু ধর্মীয় জনবিন্যাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে এমনটি নয়, ভাষিক জনবিন্যাসের ভারসাম্যও আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিহারি মুসলমানের অনুপ্রবেশ ও বিহার-উত্তর প্রদেশ থেকে মুসলমানের প্রব্রজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে উর্দুভাষী জনসংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে যেখানে উর্দুভাষী ১০% বা তার বেশি, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে উর্দু মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এই

সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এক-একটি অঞ্চল চিহ্নিত করে বসতি করছে পশ্চিমবঙ্গে আগত উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী। এমনকি তারা সূর্যপুরি প্রভৃতি অন্যান্য অ-বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বাধ্য করছে উর্দু ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে দেখানোর জন্য।

এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে উর্দুভাষী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়ায় সেই অঞ্চলগুলি কার্যত 'মিনি-পাকিস্তান'-এ পরিণত হয়েছে। সেইসব অঞ্চলে রাস্তার নামফলক থেকে সরকারি বিজ্ঞপ্তি লেখা থাকে উর্দুতে। সেখানে বাঙালি স্বাগত নয়। পুলিশ-প্রশাসনই সেখানে ঢুকতে সাহস পায় না, সাধারণ মানুষ তো দূরস্থান! ডেপুটি কমিশনার বিনোদ মেহতা থেকে সাব-ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরীকে অপরাধী ধরতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয় সেখানে।

জনবিন্যাসের ভারসাম্য বিনাশের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে সীমান্ত অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা। চুরি-ডাকাতি সেখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। গরু চুরি তো অত্যন্ত মামুলি ঘটনা। সেখানে এক শ্রেণির অনুপ্রবেশকারী গরু পাচারের সাথে যুক্ত। বাধ্য হয়েই সীমান্ত অঞ্চলের বাঙালিরা গরু নিজের বাড়ির গোয়ালঘরে না রেখে ক্যাম্পে রাখেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশকারী দুষ্কৃতীরা বুক ফুলিয়ে ছড়া কাটে, 'টাকা রাখবি ব্যাঙ্কে, গরু রাখবি ক্যাম্পে, বউ রাখবি কোথায়?' নারীহরণের ঘটনা ও ক্রমাগত হুমকির ফলে বাঙালিরা বাধ্য হচ্ছে সীমান্তবর্তী অঞ্চল ত্যাগ করে নিকটবর্তী বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে চলে যেতে। এর ফলে সীমান্তের গ্রামগুলি ধীরে ধীরে বাঙালিশূন্য হয়ে

যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সীমান্ত কার্যত পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে সরে সরে আসছে।

ধর্মীয় জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের এক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের সংস্কৃতির ওপর। মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনা বাঙালিদের থেকে কয়েকগুণ বেশি হওয়ায় তা এমনিতেই বেশিমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যানুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনজীবনের সংস্কৃতিতে ইসলামি প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা জুড়ে নামাজ পড়া পশ্চিমবঙ্গে আজ এক অতি সাধারণ দৃশ্য। ফেজ টুপি আর হিজাব তো অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার! জনসাধারণের ব্যাবহারের জন্য শৌচাগারে ইঁটের টুকরো বা নুড়ি পাথরও চোখে পড়ে। হোটেল-রেস্টুরেন্টে সবই জবাইকৃত হালাল মাংস, ঝটকা বা বলি দেওয়া মাংস এক প্রকার পাওয়াই যায় না। বহু স্কুল-কলেজে শুক্রবার নামাজের জন্য ক্লাস বন্ধ থাকে। আবার অনেক স্কুলে সরস্বতীপুজোর পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছে 'নবী দিবস'।

অন্যদিকে স্বাধীনতার সময়, সম্পূর্ণ বাংলার একটি ভগ্নাংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব 'বাংলাদেশ' নামটি অনৈতিকভাবে দখল করে নেয়। যা ১৯৬০-এর দশকেও যা বোঝাত সম্পুর্ণ বাংলাকে, তার ব্যাপ্তিকে সংকুচিত করে এক শ্রেণি সেটিকে নিজের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ায়, বিশ্বে বাঙালিত্ব ও বাংলা ভাষার

উপর একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ। পূর্ববঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আমলের অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী হিন্দুবিরোধী শাসনের চির অবসান হল - এই আশায় পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত সরকার ১৯৭১ সালে 'বাংলাদেশ' নামটি ব্যবহারে আপত্তি করেনি। কিন্তু এরশাদের শাসনকালে যখন বাংলাদেশে 'সালাফিকরণ' শুরু হল এবং ১৯৮৮ সালে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হল ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ততদিনে বিশ্ববাসী বাঙালি বলতে প্রথমেই বোঝে বাংলাদেশি মুসলমান, বাংলা ভাষা বলতে বোঝে বাংলাদেশের ভাষা। এইভাবে বাংলা ভাষা ও বাঙালিত্বকে কার্যত 'হাইজ্যাক' করে নেয় বাংলাদেশ।

এর পাশাপাশি বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে হয় অস্বাভাবিক পরিবর্তন। দেশভাগের সময় বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৫৪% আর হিন্দুর ৪৫%। সাত দশক পেরিয়ে আজ বাংলাদেশ ও ভারত মিলিয়ে বাংলাভাষীদের মধ্যে হিন্দু সংখ্যানুপাত ৩০ শতাংশেরও কম। দুই-তৃতীয়াংশের বেশি বাংলাভাষী হল মুসলমান। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে তৈরী হয় হীনমন্যতা। এর পূর্ণ সুযোগ নেয় মার্কসবাদীরা। বরাকের ভাষা আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুর আত্মবলিদানের কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে তারা প্রচার করতে শুরু করে, ওপারের বাঙালিরা অর্থাৎ বাংলাদেশি মুসলমানরাই একমাত্র বাংলা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। বাংলাদেশই একমাত্র বাংলা ভাষার প্রকৃত মর্যাদা দিয়েছে। শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্যেই বাংলা

ভাষা টিকে থাকবে। এইভাবে তারা সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে বাংলাদেশি মুসলমানরাই প্রকৃত বাঙালি। অতএব তাদের ভাষা-সংস্কৃতি অবশ্য অনুকরণীয়।

এই অনুকরণের ফলে দূষিত হচ্ছে বাঙালি হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতি। বাংলা ভাষায় বেনো জলের মত ঢোকানো হচ্ছে বাংলাদেশে প্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দ। সেলাম, কুর্ণিশ, জেহাদ, তরজা ইত্যাদি শব্দ মুড়ি-মুড়কির মত ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির দ্যোতক শব্দগুলোর পরিবর্তে পৌত্তলিকতার গন্ধমুক্ত শব্দ সুকৌশলে ব্যবহৃত হচ্ছে। রামধনুর পরিবর্তে রংধনু, আকাশির পরিবর্তে আশমানি, জলের পরিবর্তে পানি।

সাংস্কৃতিক আঙিনায় বাঙালির পয়লা বৈশাখের জায়গায় বাংলাদেশি পহেলা বৈশাখের প্রচলন করার চেষ্টা হচ্ছে। পয়লা বৈশাখের সশীষ ডাব, মঙ্গলঘট, লজ্জাগৌরী চিহ্ন, লক্ষ্মী-গণেশ, হালখাতা ইত্যাদিকে বাঙালি মানস থেকে ভুলিয়ে দিতে আমদানি করা হচ্ছে বাংলাদেশি কায়দার প্যাঁচা ও বাঘের মুখোশ, তালপাতার পাখা ইত্যাদি সম্বলিত শোভাযাত্রা। কলকাতার রাস্তায় সেই শোভাযাত্রায় গাওয়া হচ্ছে গাজি পীরের গান ও মানিক পীরের গান। সেই পীরেদের গান যাদের জীবনীতেই লেখা আছে হিন্দু শাসককে হত্যা করে হাজার হাজার হিন্দু নরনারীকে বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করার বীরত্বের কাহিনি।

সাংস্কৃতিক আঙিনায় আর এক আগ্রাসন হল একুশে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মোড়কে বাংলাদেশি সংস্কৃতির প্রচলন। তার সাথে বাংলাদেশপ্রীতির নামে সূক্ষ্ম ভারত বিরোধিতা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতীক কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে পশ্চিমবঙ্গে তৈরী হয় মডেল। বাঙালি সংস্কৃতি থেকে বাংলা ভাষাকে ছিন্ন করে চলে ভাষা নিয়ে মাতামাতি। ১৯৫২-র আন্দোলনের সাথে মুজিবের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও মুজিবের প্রতিকৃতি রাখা হয় একুশের অনুষ্ঠানে। সেই মুজিব - যার হাতে ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গায় নিহত হিন্দুর রক্ত লেগে আছে। সেই মুজিব - যিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রমনার মাঠ রমনার কালী মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অস্বীকার করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে থাকে বাংলাদেশের পতাকা, যে দেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও যেখানে বাঙালি হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক।

চেক দার্শনিক মিলান হুবল বলেছিলেন, “The first step in liquidating a people is to erase its memory. Destroy its books, its culture, its history. Then have somebody write new books, manufacture a new culture, invent a new history. Before long the nation will begin to forget what it is and what it was. The world around it will forget even faster.” হুবল ভুল বলেননি। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির ক্ষেত্রে তাঁর কথাটি সম্ভবত অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে।

মার্কসবাদীরা একদিকে যেমন বাঙালি হিন্দুর স্মৃতি ও ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে তারা নানাবিধ তত্ত্বের আমদানি করে বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের মনে কল্পিত অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা জাগরিত করতে সফল হয়েছে।

ইতিহাস ভুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে কম সেন্সর হয়নি। মার্কসবাদী মনোভাবাপন্ন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ১৯৮৯ সালে একটি গোপন সার্কুলার জারি করে, যেখানে বলা হয় স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইতে মধ্যযুগে মুসলমান আক্রমণকারী ও শাসকদের দ্বারা হিন্দুর উপর অত্যাচার যথা গণহত্যা, মন্দির লুট ও ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি উল্লেখ করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসীয় পরিমন্ডলে দেশভাগের স্মৃতি নিয়ে অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছায়াছবি হয়েছে। কিন্তু যে অত্যাচারের কারণে বাঙালি হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে একবস্ত্রে চলে আসতে বাধ্য হন, তার উপর এক ফোঁটাও আলোকপাত করা হয়নি।

কিন্তু দেশভাগ ও তার পরবর্তীকালের ভয়াবহ দাঙ্গা-গণহত্যার কথা সব সময় চেপে রাখা সম্ভব হয় না। যেটুকু ছিটেফোঁটা বাঙালি কদাচিৎ জানতে পারে, সেখানে অত্যাচারীর দোষকে লঘু করে দেখানোর জন্য দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরণের যুক্তি। কখনও বলা হয়, দাঙ্গায় দু'পক্ষই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোথাও কদাচিৎ কোনো সহৃদয় মুসলমানের মহানুভবতার ঘটনা জানা গেলে সেটাকেই বড় করে দেখিয়ে, অন্যান্য দাঙ্গা-গণহত্যাকারীদের দুষ্কর্মকে আড়াল করা

হয়। তাও সম্ভব না হলে দাঙ্গা-গণহত্যাকারীদের কৃতকর্মকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কখনও কাল্পনিক অত্যাচার, অসম্মান, অবজ্ঞার কাহিনি বানিয়ে খুন-ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া হয়, তো কখনও হিন্দু সম্পত্তি লুঠ, নারী ধর্ষণ, খুনকে দেখানো হয় শ্রেণিসংগ্রাম হিসেবে। নোবেলপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তো বলেই দিয়েছেন, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গে মুসলমান গুন্ডা কর্তৃক হিন্দু সম্পত্তি লুঠের ফলে সেখানে আপনা থেকেই ভূমিসংস্কার হয়ে গেছিল।

এইসব যুক্তিকে জোরদার করার জন্য নানান তত্ত্বের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই সমস্ত তত্ত্বের আদি তত্ত্ব হল 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব', যাতে বলা হয় বহিরাগত আর্যরা ভারতে এসে আদি নিবাসী দ্রাবিড় ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে অবদমিত করেছি। আর্য আক্রমণ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যাকে বলা যেতে পারে 'ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব অনুসারে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের অত্যাচারে ত্রস্ত বৌদ্ধসহ সমস্ত অব্রাহ্মণ জনগণ যখন মুক্তির উপায় খুঁজছিল, তখন ইসলামের আগমনে ঘটলে তারা পায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 'ভদ্রলোক নিপীড়ন তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব অনুসারে ব্রিটিশ আমলে জমিদার ছিল ব্রহ্মণ্যবাদী ভদ্রলোক ও প্রজা ছিল মুসলমান। মুসলমান প্রজা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলাত আর তার লাভ ঘরে তুলত ভদ্রলোক জমিদার। অভাবী মুসলমান প্রজাকে টাকা ধার দিত ভদ্রলোক মহাজন আর সুদের জাঁতাকলে তার সর্বস্ব লুঠ করত। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শোষণই

নয়, জমিদার বাড়িতে তাদের পৃথক ফরাসে বসতে দিয়ে তাদের অচ্ছুৎ করে রাখা হত। ব্রাহ্মণ্যবাদী নিপীড়ন তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে আরও একটি তত্ত্ব যাকে বলা যেতে পারে 'পিতৃতান্ত্রিকতা তত্ত্ব'। এটি অপেক্ষাকৃত নতুন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে বাঙালি হিন্দু সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদী হওয়ার কারণে তা পিতৃতান্ত্রিক ও নারী স্বাধীনতাবিরোধী। পরিবারে পুরুষ হলেন একমাত্র হর্তাকর্তা বিধাতা ও নারী শুধুমাত্র পুরুষের সেবাদাসী, যার নিজের মতামতের কোনো মূল্য নেই। বাঙালি হিন্দু সমাজের এই দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেই হবে নারীকে।

মার্কসবাদীদের এই তত্ত্বগুলির নিরন্তর প্রচারের ফলে, ভদ্রলোক বাঙালি অবচেতনে নিজের ও নিজের পূর্বসূরীর কল্পিত কৃতকর্মের দোষে নিজেকে দোষী বলে মনে করতে শিখেছে। সে জেনেছে যে ঐতিহাসিক কাল থেকেই সে অপরকে নিপীড়ন করে এসেছে, এমনকি ঘরে নারীদেরও সে অবদমিত করেছে, যোগ্য সম্মান দেয়নি কখনও। নিজের ও পূর্বপুরুষের কল্পিত কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত, তার মনে সীমাহীন অনুশোচনা। এই অনুশোচনা থেকেই ভদ্রলোক বাঙালি নিজেকে পাপী মনে করতে শুরু করে। ঘৃণা করতে শুরু করে নিজেকে, নিজের সমাজকে, নিজের ধর্মকে।

ভদ্রলোক বাঙালির এই কাল্পনিক পাপের বোঝা আরো ভারী হয় সমসাময়িক ঘটনাবলির দ্বারা। হরিয়ানায় খাপ পঞ্চায়েত বসিয়ে কোন হিন্দু কী করেছে তার দায়ে নিজের কল্পিত পাপের পাল্লা ভারী করে

ভদ্রলোক বাঙালি। প্যালেস্তাইনে ইজরায়েলের আগ্রাসন থেকে মায়ান্মারে রোহিঙ্গা দমন, বিশ্বমানব ভদ্রলোক বাঙালির কল্পিত পাপের বোঝা শুধু ভারীই হয়। ভদ্রলোক বাঙালির এই মানসিক অবস্থা খানিকটা 'White guilt'-এর মত। এই কল্পিত পাপজনিত অনুশোচনা থেকে কল্পিত নিপীড়িতদের বাস্তব অন্যায়কে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে ভদ্রলোক বাঙালি। বাঙালির উপর নিপীড়ন হলেও সেটাই স্বাভাবিক ও ভবিতব্য বলে মনে করতে থাকে ভদ্রলোক বাঙালি। সেই নিপীড়নকে যুক্তি দিয়ে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে সে। কোথাও কোনো বাঙালি অপর এক বাঙালির বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই ভদ্রলোক বাঙালি তাকে থামিয়ে দিতে উদ্যত হন। 'আরে দাদা ছেড়ে দিন না', 'আচ্ছা যা হয়েছে হয়েছে ...' ইত্যাদি বলে অন্যায়কারীর পলায়নের রাস্তা করে দেন। এই সর্বনাশা মানসিকতা এমন এক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে যেখানে বাঙালিকেই যেন শুধু আপোস করতে হবে, মানিয়ে নিতে হবে।

বাঙালির এই আপোসের মানসিকতার অব্যবহিত কুফল পরিলক্ষিত হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। মার্কিন রাজনীতি বিশেষজ্ঞ আন্ড্রু ব্রেইটবার্টের মতে, 'Politics is the downstream from culture.' ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেটা অন্যায়ের সাথে আপোস, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সেটা রূপান্তরিত হয় স্বজাতির প্রতি অন্যায়ের সাথে আপোসে। পশ্চিমবঙ্গে আপোসের রাজনীতির ফলে দু'টি ক্ষতিকারক ভিসিয়াস সাইকেল বা পাপচক্রের জন্ম হয়েছে। গণিতে

পুণ্যচক্র বা পাপচক্র এমন একটি চক্র, যাতে কারণ থেকে প্রাপ্ত কার্য, কারণের মাত্রাকেই আরও বৃদ্ধি করে। এর ফলে কারণ থেকে প্রাপ্ত কার্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং সেটি পুনরায় কারণের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এইভাবে কার্য ও কারণ অনন্তকাল ধরে একে অপরের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এই চক্র চলতেই থাকে। যতক্ষণ না কোনো বাহ্যিক শক্তি এই চক্রকে ধ্বংস করছে। এই চক্রের ফলাফল ইতিবাচক হলে তাকে পুণ্যচক্র বলে, নেতিবাচক হলে তাকে পাপচক্র বলে।

দেগঙ্গা থেকে নলিয়াখালি, কালিয়াচক থেকে ধূলাগড়, বসিরহাট থেকে রাণীগঞ্জ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিটা জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালি। বানতলা থেকে ধানতলা থেকে কামদুনি – ধর্ষকের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। প্রতিটা ক্ষেত্রে ধর্ষিতা বাঙালি। একটি ঘটনাতেও আজ অবধি শাস্তি দিতে পারেনি পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন। বরং চেষ্টা করেছে কীভাবে প্রমাণ লোপাট করা যায়, দোষীদের মুক্ত করা যায়। শাসকদলের পক্ষ থেকে চেষ্টা হয়েছে দাঙ্গায় আক্রান্তকেই অভিযুক্ত করার, ধর্ষিতাকেই ছেলেধরা বলে চালিয়ে দেওয়ার, ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার। যখন তা সম্ভব হয়নি চেষ্টা করা হয়েছে আক্রান্তকে টাকা দিয়ে, সরকারি চাকরি দিয়ে কিনে নেওয়ার।

প্রশাসন ও শাসকদলের এই আপোষের মানসিকতায় দাঙ্গাবাজ ও ধর্ষকেরা আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালির উপর ছোটোখাটো অত্যাচার আজ পশ্চিমবঙ্গে নিত্যদিনের ঘটনা। থানায়

অভিযোগ জানাতে গেলে অভিযোগ নেওয়া হয় না, উল্টে পুলিশের গঞ্জনা ও উপদেশ শুনতে হয়। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি নিজ প্রশাসন, নিজ সমাজের কাছে কোনো প্রতিকার না পেয়ে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক। আক্রমণ হলে বালিতে মুখ গুঁজে থাকে। এইভাবে বাঙালি যত একা হতে থাকে সে তত আক্রান্ত হতে থাকে। যতই আক্রান্ত হতে থাকে ততই একা হতে থাকে। এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রথম পাপচক্র।

ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোৎ বলেছিলেন, 'demography is destiny'। সংসদীয় বহুদলীয় গণতন্ত্রে বাস্তবিকই তাই। অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশ ও মুসলমান প্রব্রজনের ফলে এক বিপুল মুসলমান জনসংখ্যা শুধুমাত্র ব্লক ভোটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে নির্বাচনের ফলাফল। আর রাজনৈতিক দলগুলো হামলে পড়ছে সেই ব্লক ভোট পাওয়ার জন্য। এভাবেই তৈরি হয়েছে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক, যা দেখিয়ে শাসক দলকে ব্ল্যাকমেল করে মৌলানা-পীরজাদা-শাহী ইমামরা। মুসলমানদের প্রতি বঞ্চনার কল্পিত কাহিনি খাড়া করে অনৈতিকভাবে দাবি করে শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য উন্নয়ন। আপোসের মানসিকতা এখানে রূপান্তরিত হয় তোষণের মানসিকতায়। বাংলায় তোষণের রাজনীতি মূলত স্বজাতি অর্থাৎ বাঙালির প্রতি বঞ্চনার রাজনীতি। মাদ্রাসায় সরকারি অনুদান থেকে ইমাম ভাতা, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন থেকে উর্দু একাডেমিতে অনুদান, ওবিসি 'এ' কোটায় প্রায় একশো শতাংশ মুসলমানের

সংরক্ষণ - এই সবের মধ্যে দিয়ে বারে বারে বঞ্চিত হয়েছে বাঙালি। এত কিছুর পরও মৌলানা-পীরজাদা-শাহী ইমামদের মুখে শুধু মসলমানদের প্রতি বঞ্চনার কথাই শোনা যায়। আর সরকার লেগে পড়ে নিত্যনতুন তোষণের মাধ্যমে তাদের মন খুশি করতে। এটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দ্বিতীয় পাপচক্র।

আজ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাঙালিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে প্রাণ দিতে হল এই আপোসের মানসিকতা থেকে উদ্ভূত তোষণের রাজনীতির জন্যই। জিন্নাহ চেয়েছিলেন কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে, কিন্তু তা হয়নি। জিন্নাহর উত্তরসূরীরা তাঁর অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সদা তৎপর। তাই দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে কোনো উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রী না থাকলেও প্রশাসনকে প্রভাবিত করে সমান্তরাল উর্দু মাধ্যম চালু করতে সচেষ্ট তারা। তোষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রশাসনই তাদের ভাষায় যুক্তি দিতে শুরু করে, উর্দু মাধ্যম না থাকলে উর্দু ভাষার পড়ুয়া তৈরি হবে কেমন করে? অর্থাৎ লক্ষ্য উর্দু মাধ্যমের পড়ুয়া তৈরি করা - সে অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই হোক, বা প্রব্রজনের মাধ্যমেই হোক, বা সূর্যপুরিভাষী মুসলমানদের উর্দুভাষী হিসেবে দেখিয়েই হোক। উর্দু মাধ্যমের পড়ুয়ার মাধ্যমে ক্রমে একটি উর্দুভাষী গোষ্ঠী তৈরি হবে। এইভাবে দাড়িভিটে, তারপর অন্য কোথাও, ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক একটি মিনি-পাকিস্তানের জন্ম হবে। তারপর সময়মত মিনি-পাকিস্তানগুলো জুড়ে নিলেই হবে জিন্নাহর স্বপ্ন সফল হবে।

আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাবে। দাঙ্গা এবং ধর্ষণের সংখ্যা ও মাত্রাও বৃদ্ধি পাবে। আরও বেশি করে আক্রান্ত হবে বাঙালি। মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে। মুসলমানদের তোষণ ও বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়, সংসদীয় রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশীদারিত্ব বাড়বে। সুতরাং শুধু বাইরে থেকে নয়, সরকারের ভেতর থেকেও মুসলমানদের জন্য বিশেষ দাবি-দাওয়া উঠবে এবং অনৈতিকভাবে বাঙালিকে বঞ্চিত করে সেই দাবি দাওয়াগুলি মেনে নেওয়া হবে।

আপোস-তোষণের এই পাপচক্রে পড়ে বাঙালির রাজনৈতিক অস্তিত্ব আজ সংকটাপন্ন। এই পাপচক্র ধ্বংস না হলে, জনবিন্যাসের পরিবর্তনের বর্তমান ট্রেন্ড বাঙালিকে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অপাংক্তেয়তে পরিণত করবে। বাঙালির তখন শুধু বলার ক্ষমতা থাকবে, কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে যেদিন বাঙালি মূল্যহীন হয়ে পড়বে, সেদিন থেকে বাঙালির ধ্বংস আর বেশি দূরে থাকবে না। হয় সার্বিক গণহত্যার মধ্যে দিয়ে শারীরিকভাবে ধ্বংস হবে নয়তো আত্মপরিচয় ত্যাগ করে ধর্মান্তরিত হয়ে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যত্র আশ্রয় নিলে বাঙালিত্ব ভুলে সেখানকার ভাষিক পরিচয় গ্রহণ করতে হবে।

বাঙালিকে এই অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি পেতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই আপোস-তোষণের পাপচক্র দু'টিকে

ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু তা রাজনীতির মধ্যে থেকে সম্ভব নয়। শুরু করতে হবে সংস্কৃতি থেকে। সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারলে তবেই তা 'downstream'-এ রাজনীতিতে গিয়ে পাপচক্র দু'টিকে ধ্বংস করতে পারবে।

সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে গেলে প্রথমেই বাঙালির এই আপোসের মানসিকতার মূলোৎপাটন করতে হবে। বাঙালির অবচেতন থেকে নিজের এবং পূর্বসূরীর কল্পিত পাপের বোঝা ঝেড়ে ফেলতে হবে। কল্পিত পাপের অনুশোচনা থেকে মুক্ত করতে হবে বাঙালি মানসকে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বাঙালি যে অত্যাচারী, শোষক বা শ্রেণিশত্রু নয় বরং সে যে নিজেই অত্যাচারিত নিপীড়িত তা উপলব্ধি করতে হবে বাঙালি মানসকে। মার্কসবাদী ন্যারেটিভকে ছুঁড়ে ফেলে বাঙালিকে গ্রহণ করতে হবে তার নিজের ন্যারেটভ।

বাঙালির নিজস্ব ন্যারেটিভে প্রথমেই আসে বাঙালির আত্মপরিচয়। বাঙালি কে? বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়া ন্যারেটিভে বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাঙালি। সেই ন্যারেটিভে বাংলাভাষী মুসলমানও বাঙালি। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। সেই ন্যারেটিভে বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলমানরাই প্রকৃত বাঙালি কারণ তারাই ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে, বাংলাদেশ দিয়েছে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। এই ন্যারেটিভ আরও শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশের দ্বারা আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালিত্ব ও বাংলা ভাষাকে জবরদখল করার মধ্যে দিয়ে। এই ন্যারেটিভেই বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশি বুদ্ধিজীবীরা 'হাজার

বছরের বাঙালি’ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সেখানে তারা বাংলার প্রাক্-ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে দেখিয়েছেন, ইসলামের আগমনের ফলেই কীভাবে বাঙালি জাতিসত্তা তৈরি হয়। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় হিন্দুদের অবদান অগ্রাহ্য করে, তাঁরা দেখিয়েছেন, বাংলা ভাষা কীভাবে মুসলমান শাসকদের অনুপ্রেরণায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান কবিদের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগে নবজাগরণের সময় বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য হিন্দুরা কিভাবে বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন করেছিলেন, যার ফলে বাংলা ভাষা তার উৎকর্ষতা হারায়। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরে বাংলা ভাষা তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। অর্থাৎ হাজার বছরের বাংলাভাষী মুসলমানরাই প্রকৃত বাঙালি। এর থেকেও এক ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের কতিপয় বাংলাভাষী মুসলমান বুদ্ধিজীবী প্রস্তাব করেছেন, যেহেতু তাঁরাই প্রকৃত বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা বরং নিজেদের রাঢ়ী বা ঘটি বলুন! তাতে বাঙালি পরিচয়ের দ্বন্দ্বের নিরসন হবে।

কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাভাষায় কথা বললেই বাঙালি হওয়া যায়? বাংলার সংস্কৃতি ত্যাগ করে আরবের মরু সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে, শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার সুবাদেই বাঙালি? তাই যদি হয় তাহলে মার্কিন, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান সবাই তো ইংরেজ, কারণ তারা সকলেই ইংরেজি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু কখনই তা নয়। তেমনই শুধুমাত্র বাংলায় কথা বললেই বাঙালি নয়। সে-ই বাঙালি, যে বাংলা

ভাষায় কথা বলে এবং পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য ধারা বাংলার সংস্কৃতিকে ধারণ করে।

বাংলাভাষী হিন্দুরা নিজেদের নাম বাংলা ভাষাতেই রাখে। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমানেরা তাদের নাম রাখে আরবি ভাষাতে, যদিও ইসলাম ধর্মে আরবি নাম রাখাতা বাধ্যতামূলক নয়। বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে আরব সংস্কৃতিকে অনুকরণ করা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন শুধু নামের শব্দগুলোই নয়, নামের গঠনটিরও আরবিকরণ হচ্ছে। আগে নাম হত মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান ইত্যাদি। এখন নাম হচ্ছে আল মাহমুদ, মাশরাফি বিন মোর্তাজা। আল বিরুনির মত আল মাহমুদ, মহম্মদ বিন কাশেমের মত মাশরাফি বিন মোর্তাজা। মাশরাফি বিন মোর্তাজা অর্থে মোর্তাজাপুত্র মাশরাফি, তেমনই মেয়েদের ক্ষেত্রে বিন্তে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাংলাভাষী হিন্দুরা বাংলার বাইরে যেখানেই থাকুক না কেন, তারা বাংলা ভাষার চর্চা কখনই ত্যাগ করে না। সে আসাম হোক বা বিহার, দন্ডকারণ্য হোক বা আন্দামান। অপর পক্ষে বাংলাভাষী মুসলমানেরা যেখানেই যায় সেখানকার ভাষা গ্রহণ করে। মায়ান্মারের রাখাইন প্রদেশের বাংলাভাষী মুসলমানরা আরাকানি ভাষা গ্রহণ করে, রোহিঙ্গা নামক একটি জগাখিচুড়ি ভাষা ও আত্মপরিচয়ের জন্ম দিয়েছে। আসামে অসমিয়া ভাষা গ্রহণ করে হয়েছে ন-অসমিয়া, নাগাল্যাণ্ডে নাগা ভাষা গ্রহণ করে সেমিয়া, মণিপুরে মেইতেই ভাষা গ্রহণ করে

পাঙ্গাল আর করাচিতে উর্দু ভাষা গ্রহণ করে বৃহত্তর মোহাজের সমাজে মিশে গেছে।

বাংলাভাষী হিন্দু সর্বদা বাংলার দেশজ সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য ধারণ করে থেকেছে। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমান যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে নিজেকে পৃথক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজ ধুতি ছেড়ে বর্মীদের থেকে লুঙ্গি গ্রহণ করা, বা দেশজ মাছ-ভাত ছেড়ে মোগলদের বিরিয়ানি গ্রহণ করা। এমনকি জলকে 'পানি' বলাটাও উত্তর ভারতেই প্রচলিত, বাংলা ভাষায় তার ব্যবহার ছিল যৎকিঞ্চিৎ।

সুতরাং ভাষা ও সংস্কৃতির নিরিখে বাংলাভাষী হিন্দুরাই প্রকৃত বাঙালি। বাংলাভাষী মুসলমানরা অবশ্যই বাঙালি নয়। তারা হয় মুসলমান কিংবা বাংলাদেশি কিংবা বাংলাভাষী মুসলমান। কিন্তু কোনো যুক্তিতেই তারা বাঙালি হতে পারে না। সুতরাং বাঙালি মাত্রই বাঙালি হিন্দু বা হিন্দু বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায় ও আসামে শুধুমাত্র বাঙালিই হোক বাংলাভাষী হিন্দুর পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গ বাদ দিয়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অন্য হিন্দু জাতির সাথে পার্থক্য করার জন্য 'বাঙালি হিন্দু' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর আন্তর্জাতিক স্তরে যেহেতু বাংলাদেশের নিরন্তর প্রচারের ফলে বাঙালি বলতে বিশ্ববাসী বাংলাদেশি, বিশেষত বাংলাদেশি মুসলমানকেই বোঝে তাই বাঙালিকে সেখানে 'বাঙালি হিন্দু' বলেই পরিচয় দিতে হবে, যতদিন

না বিশ্ববাসীর এই ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে। এটাই বাঙালির আত্মপরিচয়ের নিজস্ব ন্যারেটিভ।

বাঙালির নিজস্ব ন্যারেটিভের দ্বিতীয় আপ্তবাক্য হল, বাঙালির বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়া মার্কসবাদী ন্যারেটিভে বাংলাভাষী হিন্দু ও মুসলমান যুগ যুগ ধরে গলা জড়াজড়ি করে বসবাস করছিল, বহিরাগত ব্রিটিশ শাসক এসে তাদের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। দেশত্যাগ করার সময় তারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশ ভাগ করে দিয়ে চলে যায়, যাতে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ চিরস্থায়ী হয়। দেশভাগের সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান যৌথভাবে স্বাধীন যুক্তবঙ্গ গঠন করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি কায়েমী স্বার্থের সাথে হাত মিলিয়ে তা হতে দেয়নি। এই ন্যারেটিভের উপর ভর করে বাংলাদেশের একদল বুদ্ধিজীবী পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্ন দেখছেন। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল মার্কসবাদী ও উদারবাদীরা সীমান্ত খুলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বাংলাদেশের গর্ভে লীন হয়ে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর। পশ্চিমবঙ্গে আজ এই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে কারণ বাঙালিকে সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ কি শুধুই দেশভাগের সময় বাংলা ভাগ করে সৃষ্ট একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখন্ড মাত্র? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতের আর পাঁচটা রাজ্যের মত শুধুই একটা অঙ্গরাজ্য? তা তো নয়। বিংশ শতকের

শুরুতে বাঙালি যখন ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নিজেকে বলিপ্রদত্ত করছিল, বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব তখন পাকিস্তানের দাবিতে আন্দোলনে রত হয়। মুসলিম লিগ নেতৃত্ব কলকাতাসহ সম্পূর্ণ বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবিকে মুখ্য নির্বাচনী ইস্যু করে। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীযুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলাভাষী মুসলমান জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে মুসলিম লিগ বাংলায় বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ক্ষমতায় এসেই, পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে কলকাতার বুকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় মুসলিম লিগ, যা কলকাতা দাঙ্গা বা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামে পরিচিত। কলকাতায় সেভাবে সফল না হতে পেরে ৮২% মুসলমান অধ্যুষিত নোয়াখালি জেলায় হিন্দু গণহত্যার পরিকল্পনা করে মুসলিম লিগ। নোয়াখালি গণহত্যা ও গণধর্মান্তরকরণের ভয়াবহতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বাঙালি সমাজ। বাঙালি নেতৃত্ব, যারা এতদিন অখন্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা মুসলিম লিগের পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেতে, বাংলা ভাগ করে বাঙালির জন্য পৃথক 'পশ্চিম বঙ্গ' প্রদেশ গঠন করার পক্ষ নেন। অবশেষে ঘটনার প্রবাহে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে, বাঙালি নেতৃত্ব বাংলা ভাগ করে, বাঙালির বাসভূমি 'পশ্চিম বঙ্গ' গঠন করে সেটিকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলান শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার (যার সংখ্যাগরিষ্ঠই মুসলিম লিগের বাংলাভাষী মুসলমান) সদস্যরা ১২৬-

৯০ ভোটে পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার প্রত্যুত্তরে বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম অঞ্চলের সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে 'পশ্চিম বঙ্গ'-কে পাকিস্তান থেকে ছিন্ন করে ভারতের সাথে যুক্ত করেন। ৩রা জুলাই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে দশ জনের মন্ত্রীসভা শপথগ্রহণ করেন। জন্ম লাভ করে 'পশ্চিমবঙ্গ'।

শুধুমাত্র একটি ভূখন্ড নয়, পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত হয় বাঙালির বাসভূমি তথা বাঙালির মুক্ত অস্তিত্বের পরিসর হিসেবে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ বাঙালির জায়গা হয় পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বাঙালির উপর নিপীড়ন সেখানেই থেমে থাকেনি। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গে বাঙালির এক ভয়াবহ গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে প্রাণ হারান আনুমানিক ১০,০০০ বাঙালি ও উদ্বাস্তু হন কয়েক লক্ষ। ১৯৬৪ সালে বাঙালির উপর সংগঠিত হয় আর একটি ভয়াবহ গণহত্যা। এই গণহত্যায় বাঙালির অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় ১৯৭১-এর গণহত্যা, যেখানে আনুমানিক ২৪ লক্ষ বাঙালিকে গণহত্যা করা হয়, শরণার্থী হয় ৮০-৯০ লক্ষ বাঙালি। মৃতের সংখ্যার নিরিখে আধুনিক যুগের গণহত্যাগুলির মধ্যে হলোকাস্টের পরেই এটি হল দ্বিতীয় বৃহত্তম গণহত্যা। ২০শে মে ১৯৭১ তারিখে খুলনা জেলার চুকনগরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ১০,০০০ বাঙালিকে হত্যা করা হয়, যা মৃতের সংখ্যার নিরিখে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণহত্যাকান্ড। অধ্যাপক সব্যসাচী দস্তিদার তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, দেশভাগের পর থেকে

পূর্ববঙ্গের ভূখন্ড থেকে পাঁচ কোটি বাঙালি নিখোঁজ হয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আজ পশ্চিমবঙ্গই বাঙালির শেষ ঠাঁই। বাঙালি নিজ ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি চর্চার ও অর্থনৈতিক বিকাশের একমাত্র পরিসর। তাই পশ্চিমবঙ্গই বাঙালির বাসভূমি। এটাই বাঙালির নিজস্ব ন্যারেটিভ।

বাঙালির নিজস্ব ন্যারেটিভের তৃতীয় উপাদান ভাষা দিবস সংক্রান্ত। প্রচলিত ন্যারেটিভে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসই হল বাঙালির ভাষা দিবস, কারণ হিসেবে বলা হয়, ওই দিন বাংলা ভাষার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার। এবং এর জন্যই পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। পরবর্তীকালে যখন পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয় তখন বাংলা ভাষার নামে তার নাম হয় বাংলাদেশ।

এখানে প্রথমে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন একুশের ভাষা আন্দোলনের চরিত্র। পাকিস্তানের গণপরিষদে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রথম উত্থাপন করেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁকে যে তিনজন গণপরিষদ সদস্য সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন বাঙালি। পূর্ববঙ্গের কোনো বাংলাভাষী মুসলমান গণপরিষদ সদস্য সেদিন ধীরেন্দ্রনাথের দাবিকে সমর্থন করেননি। বরং বিরোধিতা করেছেন। ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে যে ছাত্রনেতারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা

অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি। বাংলাভাষী মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত কম। প্রশাসন ব্যাপকহারে বাঙালিদের ধরপাকড় শুরু করতেই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। উর্দুই হয় একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর এক দু'বছর বাদেই পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব উপলব্ধি করেন যে উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কারণে বাংলাভাষী মুসলমানরা উর্দুভাষী মুসলমানদের তুলনায়, আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ছেন। এরকম চলতে থাকলে, ধীরে ধীরে উর্দুভাষীরাই সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করবেন। ফলস্বরূপ বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্বও ধীরে ধীরে তাদের ক্ষমতা হারাবেন। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তো বটেই, সংখ্যার বিচারেও বাংলাভাষী মুসলমান অ-বাংলাভাষী মুসলমানদের থেকে কম। বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব তখন সংখ্যালঘু বাঙালিকে সাথে নিয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মোড়কে এক রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করে। সংগ্রাম চলাকালীন ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে বাংলাভাষী মুসলমান নেতৃত্ব এই স্পর্শকাতর ঘটনাটিকে ভাষা আন্দোলন হিসেবে তুলে ধরে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের ভাষার প্রতি সহানুভূতির একটি জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর আর এক ধাপ এগিয়ে তাঁরা প্রচার করতে থাকেন যে, বাংলাদেশ বিশ্বের একমাত্র দেশ, যেটি ভাষার নামে হয়েছে। এই মিথ্যাচারের মাধ্যমে তারা একই ঢিলে দুই পাখি মারতে সক্ষম হয়েছে। এই আবেগপ্রবণ যুক্তি দ্বারা প্রথমত তারা 'বাংলাদেশ' নামটি চিরস্থায়ীভাবে নিজ দখলে রাখার পথ প্রশস্ত করেছ। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার উপর তাদের

একমাত্র নৈতিক অধিকারের দাবিকে আরও শক্তিশালী করতে পেরেছে।

কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন বাংলা ভাষার কোনো আন্দোলন ছিল না, তেমনই বাংলাদেশও বাংলা ভাষার নামে হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারি যদি সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন হত, তবেও কি একুশে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালির ভাষা দিবস বলা যেত? সম্ভবত নয়। দু'টি কারণে। প্রথমত, যে 'বাংলা ভাষা'- র জন্য এই আন্দোলন, সেই ভাষা ততদিনে আর বাংলা ভাষা নেই। পাইকারি হারে আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ এতটাই ঢুকেছে যে সর্বনাম, অব্যয় আর ক্রিয়াপদ বাদ দিলে বাকি সবই বিদেশী শব্দ। স্নানের বদলে গোসল, বাবার বদলে আব্বা, মাংসের বদলে গোস্ত, জলের বদলে পানি। দেবজ্যোতি রায় তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, মাংস আর জল থেকে উদ্ভূত সমস্ত শব্দগুলোতে জায়গা করে নিয়েছে গোস্ত আর পানি। ব্যাতিক্রম শুধু মাংসপেশি আর জলোচ্ছ্বাস। এই দূষিত বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন কখনই বাঙালির ভাষা আন্দোলন হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, একুশের আন্দোলন যদি সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষার আন্দোলন হত এবং বাংলা ভাষাও যদি দূষিত না হত, তা হলেও তা পূর্ব পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ আন্দোলন। তার সাথে বাঙালির - যার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যাই ভারতে, তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র দু'বছর আগেই বাঙালি নিপীড়িত, লুণ্ঠিত, ধর্ষিত

হয়ে দেশত্যাগ করেছে, সেই পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আন্দোলন কখনই বাঙালির ভাষা আন্দোলন হাতে পারে না।

ভারতবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ও পশ্চিমবঙ্গে, বাঙালিকে বাংলা ভাষায় শিক্ষার দাবিতে আন্দোলন করতে হয়েছে। ভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয়েছে শিলচরে, করিমগঞ্জে, দাড়িভিটে। এই সকল অন্দোলনই বাঙালির ভাষা আন্দোলন। তার মধ্যে বাঙালির বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গের যে ভাষা আন্দোলন তার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই উনিশে মে, সতেরই সেপ্টেম্বর, একুশে জুলাইয়ের পথ বেয়ে, বিশে সেপ্টেম্বরই বাঙালির ভাষা দিবস।

বাঙালি যখন তার নিজস্ব ন্যারেটিভকে গ্রহণ করবে তখন সে নিজে থেকেই বুঝতে পারবে যে তার অস্তিত্ব সংকট কতখানি গভীর, তার অস্তিত্ব সংকটের মূল কারণ কী। সে সচেষ্ট হবে, তার অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। বাঙালির অস্তিত্ব সংকট মূলত দু'প্রকার – (ক) আত্মপরিচয়ের সংকট (খ) শারীরিক অস্তিত্বের সংকট।

আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তি পেতে গেলে বাঙালিকে তার বাঙালি আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করে তা যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রথমে নিজের কাছে এবং পরে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, বাঙালি মানে বাংলাদেশি বা বাংলাভাষী মুসলমান নয়, বাঙালি মানে সনাতনধর্মী বাংলাভাষী হিন্দু। বাংলা ভাষা মানে চাচা, ফুফা, গোস্ত, পানি সম্বলিত দূষিত

মুসলমানি বা ইসলামি বাংলা ভাষা নয়, বাংলা ভাষা মানে বঙ্কিম-বিদ্যাসাগর-রবিঠাকুরের ভাষা। বাঙালির সংস্কৃতি মানে ঈদ-মহরম-নবীদিবস নয়, হালাল-ইফতার-কদমবুসি নয়, বাঙালির সংস্কৃতি দোল-রথযাত্রা-দুর্গাপুজোর সংস্কৃতি, পিঠেপুলি-উপোস-বিজয়ার সংস্কৃতি। পয়লা বৈশাখ মানে পেঁচার মুখোশ পরে গাজি পীরের গান নয়, পয়লা বৈশাখ মানে মঙ্গলঘটে লজ্জাগৌরী চিহ্ন এঁকে, লক্ষ্মী-গণেশ পুজো করে হালখাতা করা।

শারীরিক অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। বাঙালির নিজস্ব ন্যারেটিভের আঙ্গিকে সজ্জিত করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে। পালন করতে হবে 'বাঙালি গণহত্যা দিবস'। স্মরণ করতে হবে গণহত্যায় নিহত বাঙালিকে। গড়ে তুলতে হবে গণহত্যার স্মারকস্তম্ভ ও জাদুঘর। পালন করতে হবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। স্মরণ করতে হবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টির ইতিহাসকে। বিশে সেপ্টেম্বর পালন করতে হবে 'পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস'। স্মরণ করতে হবে দাড়িভিটের ভাষা আন্দোলনকে। শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে হবে ভাষাবীরদের।

বাঙালির এই সংকটে যেমন একদিনে তৈরি হয়নি, তেমনই এই সংকটমোচনও একদিনে হবে না। অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি পেতে বাঙালির এই প্রয়াস যেন আর পাঁচটা হুজুগের মত আর একটা হুজুগে পর্যবসিত না হয়। এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে বছরের পর বছর।

গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন প্রকৃতি রুক্ষ হয়ে যায়, জলাশয়ে যখন জল থাকে না, উদ্ভিদকূল শুকিয়ে মরে যায়, জলকষ্টে প্রাণিকূলের নিদারুণ কষ্ট উপস্থিত হয় তখন বজ্র নির্ঘোষের সাথে মুষলধারে যে বৃষ্টি নামে তার জলধারাই রুক্ষ প্রকৃতিতে আবার প্রাণের সঞ্চার করেশ। উদ্ভিদকুল আবার সবুজ, সতেজ হয়, প্রাণীকুল আবার বংশবৃদ্ধি করে। পৃথিবী আবার যেন প্রাণ ফিরে পায়। কিন্তু বৃষ্টি যদি স্বল্পস্থায়ী হয়, প্রকৃতি আবার রুক্ষ হয়ে যায়। প্রাণসঞ্চারিণী সেই বৃষ্টির মুষলধারা যেমন এক নাগাড়ে আছড়ে পড়ে তৃষিত ধরিত্রীকে জলসিক্ত করে, উর্বর করে, তেমনই বাঙালির অস্তিত্ব সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই প্রাণদায়ী সংগ্রামও চালনা করতে হবে মুষলধারায়, এক নাগাড়ে। বাঙালিকে সেই সংগ্রামকে পরিণত করতে হবে চিরস্থায়ী সংগ্রামে, যা চলবে অবিরাম। নিরবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর।